PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটাতে উত্তরবঙ্গের জমিদার সমাজ ও নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভূমিকা

শংকর বর্মন

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭২২২০৬; ই-মেইল: shankarbarmancob@gmail.com

সারসংক্ষেপ

১৯০৫ সালে গঠিত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে কেন্দ্র করেই মূলত উত্তরবঙ্গেসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল। এই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' হল কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রথম মফঃস্বল শাখা।'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিলকলকাতার বাইরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? এর উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল বাংলারবিভিন্ন জেলায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এরনিজস্ব শাখা স্থাপন করা। এপ্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য। তবে এখানে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া ভালো যে, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার আগেই ১৮৯৪ সালে হরিচরণ সেন, ১৮৯৫ সালে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ১৯০১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রাদেশিক শাখা স্থাপনের করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১] কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন রংপুরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রথম প্রাদেশিক শাখা স্থাপিত হয়েছিল? সে সময় তো বাংলার অন্য কোনো জেলাতেও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' তার শাখা সভা স্থাপন করতে পারত। আর কারাই বা রংপুরের মত একটি মফঃস্বল শহরে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' স্থাপন করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন? সেসব বিষয়ে আলোচনা করা একান্তই প্রয়োজন। কারণ তা না হলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে গড়ে ওঠা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার যে একটি পরিবেশ তৈরিহয়েছিল তা জনসম্মুখে কোনও দিনও প্রকাশ পবে না।

সূচকশব্দঃ জমিদার, পরিষদ, সাহিত্য, শিক্ষিত, রঙ্গপুর, উত্তরবঙ্গ, কর্মকান্ড।

ভূমিকা

'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটাতে যারা সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এরকিছু সদস্য এবং রংপুর অঞ্চলের বিত্তশালী জমিদারগণ। কারণ তাঁরা যদি এবিষয়ে সহযোগিতার হাত না বাড়াতেন তাহলে কখনোই ১৯০৫ সালে রংপুরের মত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' গঠিত হত না। এপ্রসঙ্গে যার নাম অগ্রগণ্য তিনি হলেন রংপুরের কুণ্ডির খ্যাতনামা জমিদার সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি রংপুরে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' স্থাপনে এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে, এর জন্য তাঁর কুণ্ডির বাসভবনে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন (১৯০৪ সাল)এক সভার আয়োজন করেছিলেন। মূলত যাদের নিয়ে এই সভা আয়োজন করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেনরংপুরের স্বনামধন্য লেখক ও গবেষকবৃন্দ। কুণ্ডির বাসভবনের এই সভায় যে প্রস্তাব'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এ দেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর কার্যনির্বাহক সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে তা গৃহীত হয়ে থাকে। যার ফলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর গঠন

সহজ হয়ে উঠেছিল[২] এবং নানাবিধ আলোচনার পর ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১২ ই চৈত্র সর্বসম্মতিক্রমে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রথম শাখা সভা হিসেবে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরীই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রথম শাখা সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন।[৩] এর কারণ তিনি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এতোটাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যে তার উপহার স্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্মকর্তারা যে তাঁকে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রথম শাখা সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা তৎকালীন রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলা পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, মালদা, বগুড়া ও দার্জিলিং এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহার,[৪] আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপের কিছু অংশ এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একাংশে সাহিত্য-সাংস্কৃতির জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্মকর্তারা যাতে সুষ্ঠভাবে কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য ১২ জন সদস্য দ্বারা একটিকার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল। তবে এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সেটি হল কার্যনির্বাহক সমিতির এই ১২ জন সদস্যের প্রত্যেকেই ছিলেন রংপুরের আদি অধিবাসী। তাঁরা হলেন[৫]-

১. মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, জমিদার, কাকিনা এস্টেট, রংপুর।

২. খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর এস্টেট, রংপুর।

৩. ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, জমিদার, নলডাঙ্গা এস্টেট, রংপুর।

৪. মনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, পৌনে চার আনা কুণ্ডি এস্টেট, রংপুর।

৫. রাধারমন মজুমদার, জমিদার, দেওয়ানবাড়ী এস্টেট, রংপুর।

৬. রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, উকিল, রংপুর আইনজীবী সমিতি।

৭. জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, কুণ্ডি গোপালপুর ছোট তরফ।

৮. দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হেড মাস্টার, গোপালপুর পোঃ শ্যামপুর।

৯. শ্রীশ গোবিন্দ সেন, প্রধান শিক্ষক, কুণ্ডি হাইস্কুল, রংপুর।

১০. কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, উকিল, রংপুর আইনজীবী সমিতি।

১১. রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উকিল, রংপুর আইনজীবী সমিতি।

১২. রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার, রংপুর আইনজীবী সমিতি ।

এঁদের স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে কেন্দ্র করে কলকাতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত রংপুর কখনোই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত না। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনার জন্য সাতজন সদস্যকে নিয়োগ করা হয়েছিল। যে সাতজন সদস্যকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন-[৬]

সভাপতি :-রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী। সহ সভাপতি :- ক) খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরী। খ) ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী।
সম্পাদক :- সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী। সহ সম্পাদক :- ক) রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। খ) কুঞ্জ বিহারী মুখোপাধ্যায়।
হিসাব রক্ষক :-আশুতোষ লাহিড়ী।

উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মূল কেন্দ্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর উন্নতির জন্য কুণ্ডির জমিদার সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী ছাড়া আরও যে সমস্ত জমিদার নানা ভাবে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের অবদানও কোনও অংশেই নগণ্য ছিল না। প্রথম দিকে পরিষদের কোনও স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় নানা সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরীতেই তার কার্যালয় ও বইপত্র রাখার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। স্থায়ী ভবন না থাকার কারণে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য এই অঞ্চলের জমিদারদের অবদান কোনও অংশেই কম নয়। তবে এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কারা, কিভাবে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন এবার সে প্রসঙ্গেই আসছি। এ বিষয়ে যার নাম সর্বপ্রথমেই আসছে তিনি হলেন রংপুরেরই একজন বিশিষ্ট জমিদার দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী। এক্ষেত্রে জমিদার দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী এতোটাই আন্তরিক ছিলেন যে তিনি তাঁর নিজের বাসভবনেই চার বছরের জন্য পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যবস্থা করে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। [৭]এই পরিস্থিতে

অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্যকে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর নতুন সহকারী সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। জমিদার দেবেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়িতে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' চার বছর কার্যপরিচালনার পর এর কার্যালয় নওয়াবগঞ্জস্থ রঙ্গপুর ধর্মসভায় তিন বছরের জন্য স্থানান্তরকরা হয়। কিন্তু পরিষদের কার্যালয় নওয়াবগঞ্জস্থ রঙ্গপুর ধর্মসভায় স্থানান্তরের আগে কিছু দিনের জন্য মন্থনার বড়পক্ষের জমিদারনী ভবসুন্দরী তাঁর রঙ্গপুর বাসভবন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন তিনি তাঁর বাস ভবন ছেড়ে দিয়েছিলেন? কারণ তিনি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি অল্প কিছু দিনের জন্যও পরিষদের কাজকর্মে কোনও ব্যাঘাত ঘটে তাহলে উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতার অভাব দেখা দেবে, যা কখনোই উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ভালো হবে না। তবে এখানেও এক জমিদার উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে? এবার সে প্রসঙ্গেই আসছি। যিনি এখানে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন নলডাঙ্গার জমিদার ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী। মাত্র এক থেকে পাঁচ টাকা বেতনের বিনিময়ে বেশ কয়েকজন কেরানী, পিয়ন ও প্রহরীকে অফিসের বিভিন্ন কাজকর্ম করতে হত, যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল। এখানেই নলডাঙ্গার জমিদার ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী অল্প বেতনের কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে নিজের বাড়িতেই তাদের খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা করেছিলেন। যাকে একেবারে নজিরবিহীন ঘটনা না বলে কোনও উপায় নেই। তবে পরিষদের প্রথম সভাপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর জীবিত থাকাকালীন 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কোনও স্থায়ী অফিস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে কেন পরিষৎ এর স্থায়ী অফিস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সে বিষয়ে আমি আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ সে দিকে আলোকপাত করলে আলোচনার পরিধি এতোটাই বিস্তৃত হবে যে যার ফলে মূল আলোচনাই উপেক্ষিত থেকে যাবে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র (১৯০৮ সাল) মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর হঠাৎ মৃত্যুর হলে তাঁর স্মরণার্থে পরিষদের নিজস্ব কার্যালয় 'মহিমারঞ্জন সারস্বত ভবন' তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়। পরবর্তীতে আবার 'মহিমারঞ্জন সারস্বত ভবন'-এর নতুন নামকরণ করা হয় 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল'। ১৯১৪ সালে এই 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে'ই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কার্যালয় পাকাপাকি ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। যা দেশভাগের আগে পর্যন্ত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও তার সংগ্রহশালার কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পরিষদের স্থায়ী অফিস নির্মাণের জন্য রংপুর অঞ্চলের জমিদার সমাজের আর্থিক সহায়তার দিক থেকেও একটা বড় অবদান ছিল। কিন্তু কেন তাঁরা এব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন সে প্রশ্নও তৈরি হওয়া স্বাভাবিক? কারণ এটা এই অঞ্চলের জমিদার সমাজ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি আর্থিক দিক থেকে তাঁরা পরিষদকে সহযোগিতা না করেন তাহলে রংপুরে বসবাসকারী অল্প কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি একাজ কোনও ভাবেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিতে পারবেন না। অর্থাৎ এখানে থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে রংপুর তথা উত্তরবঙ্গের জমিদারগণ আন্তরিক ভাবেই চেয়েছিলেন রংপুরের মত একটি মফঃস্বল শহরে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠুক, এবং সেই প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ খনন, প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিলালিপির ধ্বংসাবশেষের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তকের পুনঃপ্রকাশ

দিনকে দিন বৃদ্ধি পাক। তবে এই অঞ্চলের জমিদার সমাজ শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকেন নি, এর পাশাপাশি তাঁরা এটাও চেয়েছিলেন যে যাতে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ'-কে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর নব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী তরুণ সমাজের আবির্ভাব হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ এখান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে কেন জমিদার সমাজ 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ' গঠনে আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতা করেছিলেন। যেখানে তাঁরা কোনও দিনও কার্পণ্যতার কথা চিন্তাভাবনা করেন নি। জমিদারদের এসব চিন্তাভাবনা থেকে এটি ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারা যায় যে এই অঞ্চলের বিত্তশালী জমিদাররা মানসিক দিক থেকে যথেষ্টই সংস্কৃতিপরায়ণ ছিলেন। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' গঠনে কিভাবে এই অঞ্চলের জমিদারগণ অর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন এবার সেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। তবে পরিষদ গঠনে বা তার কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারেযে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত তার চেয়েও বেশি অর্থ জমিদারেরা নিঃস্বার্থভাবে দান করেছিলেন। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর অন্যতম অঙ্গ সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'(উবসাস)-এর মোট দশটি অধিবেশন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল জাঁকজমকের সহিত আয়োজিত হয়েছিল তার জন্য যে মোটা অঙ্কের অর্থ দরকার ছিল সেগুলিও উত্তরবঙ্গের জমিদারগণ মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। সম্মেলনের এই ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জমিদাররা বিষেশভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন কাকিনার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায়। অর্থাৎ জমিদারদের এই আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া যে এই বিশাল কর্মকান্ড কোনও ভাবেই সম্ভব হত না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহনেই।[৮] তবে এখানে একটি কথা বলে নেওয়াই ভালো যে শুধুমাত্র আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করেই জমিদার সমাজ ক্ষান্ত হন নি। এর পাশাপাশি তাঁরা বিনামূল্যে জমিও দান করেছিলেন। এক্ষেত্রে রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরীর নাম অগ্রগণ্য। কারণ তিনি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' এর স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে ১.২০ একর জমি দান করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিলেন যা কোনও ভাবেই ভোলার নয়।[৯]

'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর উন্নতিকল্পে যে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ তথা রংপুরের জমিদাররাই আর্থিক দিক থেকে সহযোগিতা করেছিলেন তা নয়, এর বাইরেও অনেক জমিদার বা রাজারা পরিষদকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কারা, কিভাবে এক্ষত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। এ বিষয়ে যার নাম সর্বপ্রথমেই আসছে তিনি হলেন মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তিনি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর উন্নতিকল্পে ৫০০ টাকা নিঃস্বার্থভাবে দান করে সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে পরিষদের আজীবন সদস্য হয়েছিলেন যা কোনও দিনও ভোলার নয়। এর পর আসছি দীঘাপতিয়ার নাটরের জমিদার কুমার শরৎ কুমার রায়ের প্রসঙ্গে। তিনি পরিষদকে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজকর্মের জন্য ৫০০ টাকা দান করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পরিষদকে আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের রাজ রাজাদের ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কারণ দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের রাজারা এমনিতেই ছিলেন সংস্কৃতিপরায়ণ। এ প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের

যে দুজন রাজার নাম উল্লেখ না করে কোনও উপায় নেই তাঁরা হলেন রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণভূপবাহাদুর ও তাঁর ভাই জীতেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর। উভয়েই পরিষদের কর্মকান্ডের ব্যাপকতার জন্য ৫০০ টাকা দান করেছিলেন এবং আজীবন সদস্য পদ লাভ করেছিলেন যা কখনোই ভোলার নয়। এছাড়াও রংপুরের বাইরের কম-বেশি প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের সাধ্য মত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে আর্থিক দিক থেকে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ কতটা ছিল সে বিষয়ে কোনও তথ্য হাতে পাই নি। এঁরা প্রত্যেকেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ময়মনসিংহের মুক্তগাছার কৃষ্ণদাস আচার্য্য, দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, জলপাইগুড়ির জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়কত, আসামের গৌরিপুরের রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, কোচবিহারের গোবরাছাড়ার জগদীশ নারায়ণ মুস্তাফী, কোচবিহারের রাজা চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বকসী প্রমুখ।[১০]

রংপুরের জমিদার সমাজ 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি পরিষদকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে এক বিশেষ অবদান রেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন কোন জমিদার কিভাবে পরিষদকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে এক বিশেষ অবদান রেখেছেন? সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের জমিদার সমাজের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তা উপেক্ষিতই থেকে যাবে। সর্ব প্রথমেই আসছি যে সমস্ত জমিদাগণ উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন জমিদার হলেন রংপুরের কুণ্ডির জমিদার সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী, রংপুরের বাইরে রাজশাহীর মহাদেবপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বকসী, নলডাঙ্গার জমিদার ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, গাইবান্ধব জমিদার রাধা বিনোদ রায়চৌধুরী, রংপুরের মাহিগঞ্জের জমিদার হরগোপাল দাস কুণ্ডু, নীলফামারীর জমিদার বসন্ত কুমার লাহিড়ী প্রমুখ। রংপুরের জমিদারগণ পরিষদকে এতটাই ভালো বাসতেন যে, তাঁরা পরিষদের কাজকর্মকে আরও বেশি বেশি করে প্রসারিত করার জন্য সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু কিভাবে? এ ব্যাপারে তাঁরা নগদ পুরস্কার প্রদানের কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং সেটি কার্যকরীও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যার নাম স্বনাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে তিনি হলেন রংপুরের কাকিনা এস্টেটের জমিদার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর অন্যতম অঙ্গ সংগঠন 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এ বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী পরিষদের সম্পাদকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন। গোপালপুরের (কুন্ডির) জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীবছরে ত্রিশ টাকা শাখা সভাকে দিয়েছিলেন 'কাশীচন্দ্র পুরষ্কার' এর জন্য। কিন্তু কেন? কারণ জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর পিতার নাম ছিল স্বর্গীয় কাশী চন্দ্র রায়চৌধুরী। জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী চেয়েছিলেন এই পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে যাতে তাঁর পিতা স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র রায়চৌধুরী অমর হয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আর একজন জমিদার অন্নদাপ্রসাদ সেনের নামও স্মরণীয় হয়ে আছে।[১১] এরপর আসছি সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ও তাঁর ভাই মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর কথায়। এঁরা প্রতি বছর 'মধুসূধন রৌপ্য পদক' নামে একটি পুরষ্কার দেওয়ার

বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবে এই পুরষ্কার শুধুমাত্র তাদেরকে দেওয়া হত যারা প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। 'জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা' নামক প্রবন্ধের জন্য যিনি এই পুরষ্কার প্রথম পেয়েছিলেন তিনি হলেন রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র রমণীমোহন ভট্টাচার্য। মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরীও 'গঙ্গাঁধর রৌপ্য পদক' নামে একটি পুরষ্কারের বন্দোবস্ত করেন। মূলত তিনি এই পুরষ্কারটি চালু করেন তাঁর স্বর্গীয় পিতা গঙ্গাধর রায়চৌধুরীর স্মরণার্থে।[১২] জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বকসী 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে এককালীন ৫০ টাকা দিয়েছিলেন। যা থেকে প্রতি বছর তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বকসীর নামে একটি পুরষ্কার দেওয়া হত। তবে এই পুরষ্কার শুধুমাত্র বাংলা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে দেওয়া হত। রংপুর অঞ্চলের জমিদারদের এ হেন কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন। তবে অনেক জমিদার তাঁদের পূর্বপুরুষদের নামে যেসব পুরষ্কার চালু করেছিলেন তা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে হয়তো তাঁরা চেয়েছিলেন এই সব পুরষ্কারের মাধ্যমে যেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকেন।

'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রংপুরে বসবাসকারী স্থানীয় ও বহিরাগত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য আবদান ছিল। তবে এ বিষয়ে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কেমন আবদান ছিল এবার সে বিষয়ের ওপর আলোচনা করার চেষ্টা করছি। এই অঞ্চলের জমিদার সম্প্রদায় পরিষদকে যেমন কোনও আর্থিক বাধার সম্মুখীন হতে দেন নি, ঠিক তেমনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্মকান্ডের বিকাশে চেষ্টার কোনও খামতি রাখেন নি। এই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যারা এতদিন ধরে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের কোনও সুযোগ পেতেন না তাঁরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের রাস্তা পেতে লাগলেন। তবে শুধুমাত্র এখানেই শেষ নয় এর পাশাপাশি নব শিক্ষিত তরুণ সমাজও বিভিন্ন মৌলিক লেখনীর মাধ্যমে তাঁদের সৃজনশীল মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে লাগলেন। যার ফলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' সমগ্র বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার দ্বিতীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে লাগল। এতদিন ধরে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি কলকাতা কেন্দ্রিক 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর মুখপত্র 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এর অধিবেশনগুলিতে কোনও দিন প্রবন্ধ প্রকাশ ও পাঠের সুযোগ পেতেন না তাঁরা খুব সহজেই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' গড়ে ওঠার ফলে সে সব ক্ষেত্রে সুযোগ পেতে লাগলেন। এভাবেই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-কে কেন্দ্র সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে এক শ্রেণীর নব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন লেখক, উকিল, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও ডাক্তাররা।

উত্তরবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন পঞ্চানন সরকার(বর্মা), তসলিমুদ্দীন আহম্মদ খান বাহাদুর, আশুতোষ লাহিড়ী, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

তত্ত্ব সরস্বতী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ, মহামোহপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ। সর্ব প্রথমেই আসছি পঞ্চানন সরকার(বর্মা)-র কথায়। পঞ্চানন সরকার(বর্মা) 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁর নিজের লেখা প্রবন্ধ 'কথা ও ছিক্কা','গোবিন্দ মিশ্রের গীতা','রঙ্গপুরের রূপকথা', 'পাদটীকা' (মহিলা ব্রত),ও 'জগন্নাথী বিলাই' প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র জন্মলগ্ন থেকে প্রথম সাত বছর (১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[১৩]

এরপর আসছি জলপাইগুড়ির চন্দনবাড়ি গ্রামের (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পঞ্চগড় জেলা) বাসিন্দা তসলিমুদ্দীন আহম্মদ খান বাহাদুরের প্রসঙ্গে। তসলিমুদ্দীন আহম্মদ খান বাহাদুর পেশায় একজন আইনজীবী হলেও লেখালেখির প্রতি তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 'পীর','সত্যপীর', 'পীরবর্হক্' ও 'বড়পীর' নামক প্রবন্ধ 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশ করে তিনি সৃজনশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[১৪] রংপুর শহরের গুপ্তপাড়ার অধিবাসী আশুতোষ লাহিড়ী 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আশুতোষ লাহিড়ী পেশায় সরকারি ইঞ্জিনীয়ার হলেও পরিষদের শাখা পরিষৎ গঠনের জন্য ১৩১২ বঙ্গাব্দে ১২ই বৈশাখ যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সভার সভাপতি ছিলেন। এসব ছাড়াও তিনি পরিষদের প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। [১৫]নদীয়া জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা) অধিবাসী আইনজীবী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রংপুর জেলার বাইরের বাসিন্দা হলেও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল 'বাভ্রবী কায়া', 'উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান','মাধাই নগর তাম্রশাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য', 'গরুড়স্তম্ভ-লিপি' ও 'বোধিসত্ব লোকনাথ'।[১৬] কুন্ডির জমিদার সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর আজীবন সম্পাদক ও খ্যাতনামা লেখক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল রঙ্গপুরে মহাম্মদীয় তীর্থ ও সাহ ইস্মাইল গাজীর বিবরণ', 'প্রাচীন কামরূপ','রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ', 'প্রাচীন মুদ্রা', 'মহতী স্মৃতি','নিবেদন', 'উদ্বোধন','শেরশার কামান' ও'পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর'।

সিলেট জেলার (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) অধিবাসী সাহিত্যিক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর একবিংশ বার্ষিক অধিবেনের সভাপতি ছিলেন।[১৭] দিনাজপুরের বাসিন্দা যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী পেশায় একজন আইনজীবী হলেও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর পরিষৎ এর কার্যনির্বাহক কমিটির একজন সদস্যও ছিলেন। পেশায় স্কুল শিক্ষক রংপুরের মাহিগঞ্জের অধিবাসী প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।[১৮] রংপুরের ইটাকুমারী গ্রামের বাসিন্দা মহামোহপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন শিক্ষকতার

পেশায় যুক্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তিনি নানান ব্যস্ততার মধ্যেও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর জীবনাবাসনের (১৯০৯ সাল) পর যাদবেশ্বর তর্করত্নকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত পরিষৎ এর সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিল এবং শত কাজের মধ্যেও তিনি সেই দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার নাওডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশপরিষৎ-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে ওতোপ্রত ভাবে যুক্ত ছিলেন। যা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়ক ছিল। কেশবলাল বসু সাহিত্যরত্ন বিদ্যাবিনোদ শিক্ষকতার পাশাপাশি পরিষদের কার্যনিবর্ম্মাহক কমিটির গ্রন্থাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন[১৯]। ফলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কাজকর্মের গতি খুব সহজেই ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে পরিষদের মান ও গৌরব উভয়েই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পাবনা জেলার বাসিন্দা কালীকান্ত বিশ্বাস একজন পুলিশ অফিসার হলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি পরিষদের বিভিন্ন মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে যোগদান করে কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি পরিষদের মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কুন্ডির জমিদার পরিবারের সন্তান মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী নিজ অর্থ ব্যয়ে কবি কমলোলোচনের 'চন্ডিকা বিজয়' গ্রন্থটি পুণমুদ্রণ করে পরিষদের সদস্যদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এর ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি পরিষদের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তবে শুধুমাত্র এখানেই শেষ নয় এর পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক প্রত্নসামগ্রী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এদান করেছিলেন - যা কখনোই ভোলার নয়। নলডাঙ্গার জমিদার পরিবারের সন্তান ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী বরাবরেই 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সঙ্গে ওতোপ্রত ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম থেকে পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর সাথে সাথে নানা কাজে সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর প্রথম সাংবৎসরিক সম্মেলনে দক্ষতার সহিত আহক্ষায়কের দায়িত্ব (অভ্যর্থনা কমিটির) পালন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি পরিষদের প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির তিন নং সদস্য এবং কর্মচারী সভার দুই নং সহ-সভাপতি হিসেবেনির্বাচিত হয়েছিলেন[২০]। এছাড়াও তিনি পরিষদের মুখপত্র 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র পত্রিকাধ্যক্ষ বা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উপসংহার

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, এভাবেই রংপুর অঞ্চলের বহু জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টার ফলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্মকান্ড এবং খ্যাতি দিনকে দিন বৃদ্ধি করেছিলেন। কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বরাবরেই ছিল। রংপুর অঞ্চলের বহু জমিদার পরিষদকে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁদের লেখালেখি প্রকাশ করেছিলেন। এবং সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তরুণ শিক্ষিত সমাজকে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য নানা পুরষ্কারও চালু করেছিলেন। যার ফলে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর মান ও মর্যাদা উভয়েই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে রংপুর অঞ্চলের জমিদার ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের কর্মকান্ড শুধুমাত্র এখানেই শেষ হয় নি। এসব ছাড়াও তাঁরা বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন মুদ্রা, পুঁথি, নানাবিধ মূর্তি প্রভৃতি 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর সংগ্রহশালায় দান করে পরিষৎ-কে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন যা কখনোই ভোলার নয়। অর্থাৎ এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে কলকাতা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর কর্মকর্তাদের উদার মানসিকতার পাশাপাশি যদি এই অঞ্চলের জমিদার ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'-এর বিভিন্ন কর্মকান্ড নিজেদের কাধে তুলে না নিতেন তাহলে কখনোই এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগে অখন্ড বাংলার দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠত না। এবং সেই সঙ্গে পরিষদকে কেন্দ্র করে তরুণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও যে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মানসিকতা সেভাবে গড়ে উঠত না তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র

১. ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর(১৩১২-১৩৪৮),*বাংলাবাজার ঢাকা, গতিধারা, ২০১২, পৃ. ১৮-১৯।

২. সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী:'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', *রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা(বিশেষ সংখ্যা),* রংপুর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

৩. শ্রীপঞ্চানন সরকার (সম্পা):*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,*১ম ভাগ, ১ম-২য় সংখ্যা, রঙ্গপুর,রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. অতিরিক্ত-২।

৪. আনন্দগোপাল ঘোষ:*স্বাধীনতা ষাটঃ প্রসঙ্গ ছেড়ে আসা মাটি,*কলকাতা,সাহিত্য ভগীরথ প্রকাশনী, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮।

৫. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রংপুরের ইতিহাস (১৬৮৭-১৯৪৭),*বাংলাবাজার ঢাকা, গতিধারা, ২০১২, পৃ. ৩৩১।

৬. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জাম: *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎঃ বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চার প্রথম বাতিঘর(১৩১২-১৩৪৮),*প্রাগুক্ত,২০১২, পৃ. ২১।

৭. তদেব, পৃ. ৩৩।

৮. তদেব, পৃ. ২০৩।

৯. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রংপুরের ইতিহাস(১৬৮৭-১৯৪৭),*প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

১০. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর (১৩১২-১৩৪৮),* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭।

১১. তদেব, পৃ. ৩৪।

১২. শ্রীপঞ্চানন সরকার(সম্পা):*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,*১ম ভাগ, ১ম- ২য় সংখ্যা, রংপুর,রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬।

১৩. দেবজ্যোতি দাশ:*রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সূচী,* ১ম-১৯শ ভাগ, কলিকাতা,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯।

১৪. তদেব, পৃ. ৮।

১৫. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

১৬. দেবজ্যোতি দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

১৭. তদেব, পৃ. ৯।

১৮. ড.মুহম্মদ মনিরুজ্জামান:*রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদঃ বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চার প্রথম বাতিঘর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২১।

১৯. তদেব, পৃ. ২২২।

২০. পঞ্চানন সরকার(সম্পা):*'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা',* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।